International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-III, May 2022, Page No. 14-21
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i3.2022.14-21

শামসুর রাহমানের কবি-চেতনার গভীরে ভাষাপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম: ‘বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’ এবং ‘জন্মভূমিকেই’

পীরুপদ মালিক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Shamsur Rahman(1929-2006) is one of the leading figures of modern Bengali Poetry in Bangladesh. In the second half of the twentieth century, Shamsur Rahman is well-established as a great, popular poet in both Bangladesh and West Bengal. Not only in Bengal, he earned great admiration among the lovers of Bengali poetry all over the world. Two widely popular poems of Shamsur Rahman are ‘Barnamala, Amar Duhkhini Barnamala’ and ‘Janmabhumikei’ that deal with the freedom movement of Bangladesh. He believed that the role of a poet is closely related to the cultural progress of a nation. We can note the celebratory representations of generous, humane attitude and romantic revival in his works. The post emergency incidents left a deep impression on his mind. As a result, the tedious urban life has been depicted in some of his poems. His patriotic and nationalist identity is undoubtedly inseparable from his personality. Each and every person loves own mother tongue. Shamsur Rahman is no exception. His mother tongue is Bengali and it reigns in his mind for ever. Deep love for his mother tongue is well-expressed in the poem ‘Barnamala, Amar Duhkhini Barnamala’. All the fifty one letters of Bengali alphabet always glitter in his heart like stars. The poem ‘Janmabhumikei’ deals with the pain of modern life, the tediousness and monotony of urban life and at the same time romanticism, love for the old days and an intense love for his motherland Bangladesh have been reflected vividly in the poem. In the long run, this poem has become a great patriotic poem. In both of his poems discussed in this essay, the poet has made a smooth journey from his love of mother tongue towards love for his country.

Keywords: Shamsur Rahman, Bangladesh, Pain of life, Mother tongue, Patriotism, Romanticism

।। ১ ।।

পঞ্চাশের দশকের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি শামসুর রাহমান। এই সময়ের কবিরা সার্বিকভাবে আত্মনিমগ্ন উপলব্ধির চেতনার গহনে নিমগ্ন ছিলেন না। আত্মগত রোম্যান্টিক অনুভূতির বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটে থাকে। অনেক রোম্যান্টিক কবিই সেই সময়ে তাঁর চারিদিকের জীবনযাত্রার ঘটনাবলী সম্পর্কে সচেতন থাকতেন।

প্রাত্যহিক দিন যাপনের সঙ্গে লগ্ন হয়ে যেতেন। তাই বিশিষ্ট সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা' গ্রন্থে লিখেছেন – "নাগরিক বৈদগ্ধ্যে সবচেয়ে আধুনিক কবি শামসুর রাহমান, তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রতীচ্য-প্রভাবিত। যেমন তিনি রোম্যান্টিক, তেমনই তাঁর কবিতায় আছে যন্ত্রণাসম্ভব আত্মানুসন্ধান। তিনি বিশ্বনাগরিক, আবার বাংলাদেশই তাঁর শিকড়। তাঁর কবিতা বুদ্ধিদীপ্ত, আবার আবেগময়।"[১] এই সময়ের কবিরা কখনও স্বদেশ, কখনও স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-মমতার, সুখ-দুঃখের ঘটনাগুলিকে নিয়ে কবিতা লেখেন। শামসুর রাহমান এর ব্যতিক্রম নন।

শামসুর রাহমান তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অগ্রগণ্য কবি। আসলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়। পূর্ববঙ্গ যুক্ত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে। একমাত্র ধর্ম ছাড়া পাকিস্তানের দুই অংশ – পূর্ব-পাকিস্তান এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য ছিল না। দুই দেশের অধিবাসীদের ভাষা, খাদ্যাভাস, আচরণ, পোশাক, শিল্প-সংস্কৃতি সবই ছিল ভিন্ন। তাই পূর্ব-পাকিস্তানে মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয় মহম্মদ আলি জিন্নার নির্দেশনামা থেকে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে, শুধু তাই নয়, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে জানানো হল, বাংলা লিখতে এবং পড়তে হবে আরবি হরফে; বাংলা বর্ণে নয়। এই নির্দেশনামার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে প্রবল আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৭-১৯৪৮ থেকে। এই আন্দোলন পরিপূর্ণ রূপ পায় নাজিবুদ্দীনের ফতোয়ায়। যার অবশ্যম্ভাবী ফল পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন। প্রতিবাদী ছাত্র-যুব সমাজের আন্দোলন ও বিক্ষোভ ভাঙতে মার্কিন মদতপুষ্ট পাকিস্তানি শাসকেরা চরমপন্থা অবলম্বন করলেন। প্রতিবাদী ছাত্রসমাজের বিক্ষোভ ভেঙে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানি সেনারা বেয়নেট, বন্দুক, বুলেট প্রভৃতি ব্যবহার করে। প্রতিবাদী ছাত্রদের ওপর পাকিস্তানি পুলিশ গুলি চালায়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর গুলি চালালে পাঁচজন ছাত্র(আবুল, বরকত, সালাম, আব্দুল জব্বর ও রফিক উদ্দিন) শহিদ হয়। এরপর গ্রামবাংলা থেকে জনকল্লোল এসে ভেস্তে দেয় ঢাকা প্রশাসনের দুর্গ। বাধ্য হয়ে পাকিস্তান সরকার তাদের স্বৈরতন্ত্রী ভাষা আগ্রাসন রদ করলেন। এ কারণেই ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-শহিদ দিবস, যাকে পরবর্তীকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্বীকৃতি দেয় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে।

ভাষা জাতিসত্তার চেতনাকে বহন করে। ১৯৫২-র পর কিন্তু ভাষা আন্দোলন পুরোপুরি থেমে গেল না। পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতার অধিকারী উর্দুভাষীদের সঙ্গে বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানের সংঘাত চলতেই থাকে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল। কিন্তু লড়াই থেমে থাকল না। আবার ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সেই সংঘাত চরম আকার ধারণ করে। কবি শামসুর রাহমানের কথাতেই স্পষ্ট –

"অত্যাচারী দিন, স্বৈরাচারী রাত
আমাকে রোজ পুড়িয়ে করে ছাই-
পাই না তোমার সাক্ষাৎ।"[২]

সে সময় আমরা জানি, দিনের বেলায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাত পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা। আর রাতের বেলায় তারা বাংলাদেশের যুবতী নারীদের ধরে বন্দি করে তাদের ওপর চালাত শারীরিক অত্যাচার। এক কথায় যৌন সম্ভোগ করত হিংস্র পশুর মতন। দেশের মুক্তি আন্দোলনের সেই ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে কবি, মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে যে সব শহিদ অমর হন তাদের উদ্দেশে বারবার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন।

বাংলা ভাষার সংগ্রামে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামি লীগ। গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রস্তাব পাস হয় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ৮-ই মে – পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পরে। তার পরেও তর্ক থামে নি, কিন্তু বাংলা ভাষার পক্ষে প্রবল জনমত আর রোধ করে রাখা যায় নি। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করা হয়। তাতে অবশ্য বলা হয় যে কুড়ি বছর পরে এ বিধান কার্যকর করা হবে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানেও এর পুনরক্তি করা হয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষার কার্যকাল আরও ছয় বছর পিছিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতালাভের পরে, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানে সহজ সরল স্পষ্ট উক্তি- 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা।' একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে গাফ্ফার চৌধুরীর গানটা সকলেরই মনে পড়বে –

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি।।"[৩]

এই গানটি সারা বাংলার বুকে একটি শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল। কবি শামসুর রাহমান অন্যান্য অনেকেরই মতো 'অমর একুশে' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন –

"আর যেন না দেখি কার্তিকের চাঁদ কিংবা
পৃথিবীর কোনো হীরার সকাল,
কোনোদিন আর যেন আমার চোখের কিনারে
আকাশের প্রতিভা সন্ধ্যানদীর অভিজ্ঞান আর
রাত্রি রহস্যের গাঢ় ভাষা কেঁপে না ওঠে,
কেঁপে না ওঠে পৃথিবীর দীপ্তিমান দিগন্তের তারা।"[৪]

কবি শামসুর রাহমান বাংলাদেশ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। তিনি বাংলাদেশের নাগরিক কবি। বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে দুই বাংলায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত। শুধু দুই বাংলাই নয়, পৃথিবীর যেখানে যত কবিতাপ্রিয় বাঙালি আছেন, শামসুর রাহমান তাঁদের সবার কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর লিখিত তাঁর দুটি কবিতা খুবই জনপ্রিয় – 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' এবং 'জন্মভূমিকেই'।

।। ২ ।।

শামসুর রাহমান ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর মামারবাড়ি ঢাকার ৪৬ নং মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুখলেসুর রাহমান চৌধুরী ও মাতা আমেনা বেগম। কবিরা তেরো জন ভাই-বোন, এর মধ্যে শামসুর রাহমান চতুর্থ। কবির শৈশব শিক্ষা পুরোনো ঢাকার পোগোজ ইংলিশ হাই স্কুল থেকে। পরে আই. এ. পাশ করেন ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে। শামসুর রাহমান ঢাকা কলেজে ভর্তি হন, সেখান থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রথম কবিতা 'উনিশ শো ঊনপঞ্চাশ' প্রকাশিত হয়েছিল। কবি ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনার জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, তবে শেষ করতে পারেন নি। তিনি স্বীকার করেছেন যে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে বোদলেয়ার, র‍্যাবো, রিলকে, ইয়েটস তাঁকে প্রভাবিত করে। শামসুর রাহমান সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায়। পরে সরকারী পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান' এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বিশ শতকের পাঁচের দশকে বাংলাদেশের কবিতার আন্দোলনে জনপ্রিয় নাম শামসুর রাহমান। এখনও পর্যন্ত কবি শামসুর রাহমান ফাউণ্ডেশান থেকে পাওয়া তথ্য অনিযায়ী শুধু কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা পঁয়ষট্টি, উপন্যাস লিখেছেন চারটি, আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ দুটি – এছাড়াও অনুবাদ কবিতা, অনুবাদ নাটক, প্রবন্ধ নিবন্ধের কলাম, গল্প সবমিলিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাহিত্য চর্চা করে গেছেন। যে কারণে তাঁকে বাংলাদেশের মানুষ সম্মান দিয়েছেন- 'Unofficial poet laureate of Bangladesh'. তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ – 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'(১৯৬০)। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – 'রৌদ্র করোটিতে'(১৯৬৩), 'বিধ্বস্ত নীলিমা'(১৯৬৭), 'নিরালোক দিব্যরথ'(১৯৬৮), 'নিজ বাসভূমে'(১৯৭০), 'বন্দীশিবির থেকে'(১৯৭২), 'দুঃসময়ের মুখমুখি'(১৯৭৩), 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে'(১৯৭৭), 'যে অন্ধসুন্দরী কাঁদে'(১৯৮৪), 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'(১৯৮৮), 'মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই'(১৯৯৬), 'টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো'(১৯৯৮), 'শুনি হৃদয়ের ধ্বনি'(২০০০) প্রভৃতি।

শামসুর রাহমান বিশ্বাস করতেন যে, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে কবির ভূমিকা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাঁর কবিতায় উদারমনা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, উদারমানবতা, রোম্যান্টিক বিদ্রোহ সব এসেছে। জরুরী অবস্থার পরবর্তী ঘটনাগুলি তাঁর মনে গভীরভাবে ছায়াপাত করে। ফলস্বরূপ বেশ কিছু কবিতার নগর সভ্যতার ক্লান্তিকর দিনগুলি ফুটে উঠেছে। তাঁর স্বাদেশিকতাবোধ, জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে যেমন কোনো দ্বিধা নেই, তেমনি তাকে নিজের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে বুকের রক্ত ও মনের জটিলতায় জড়িয়ে মিশিয়ে নেওয়া হয়েছে সাবলীলভাবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা পরিবর্তনকে বহন করে কবি যে কাব্য সৃষ্টি করেন- এই দুটি কবিতায় ভাষাপ্রেম ও দেশপ্রেম বিশেষ সম্পদ হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষাপ্রেম তাঁর আত্মগত – "বাঙলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে রোদ, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন'। এছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমবয়সী ও সহমর্মী এই কবি অন্তরের নানা অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাব্য-কবিতায়। তাঁর প্রিয় জন্মভূমি তাঁকে খালি হাতে ফেরায়নি, সম্মানিত করেছে – আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার(১৯৬৯), একুশে পদক(১৯৭৭), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, জীবনানন্দ পুরস্কার, আবুল মনসুর আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার, স্বাধীনতা পুরস্কার(১৯৯১)। ভারত থেকে পেয়েছেন 'আনন্দ পুরস্কার'। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এহেন কবি প্রসিদ্ধি নিয়ে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনটেনসিভ কেয়ারে বারো দিন লড়াই করার পর ১৭-ই আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

।। ৩ ।।

'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটি কবির 'নিজ বাসভূমে'(১৯৭০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবির মাতৃভাষা বাংলা, তাই কবি সত্তার ভাষা বাংলা নক্ষত্রের মতো জ্বলন্ত হয়ে বিরাজিত। মাতৃভাষাপ্রীতি প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বে বর্তমান থাকে। কবির সচেতন সত্তায় তাঁর ভাবলোকে এমনকি মনে-মননে বাংলা ভাষার প্রতি উজ্জ্বল উপস্থিতি। নক্ষত্রপুঞ্জের মতো দীপ্ত হয়ে আছে যে ভাষাপ্রেম, তা নিশান উড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা বর্ণমালায় একান্নটি বর্ণই কবির হৃদয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে দীপ্ত নিশানের মতোই সবসময়

অবস্থান করে। মাতৃভাষা যেকোনো মানুষেরই পরম আদরের, পরম ভালোবাসার, মমতার ধন। এই মমতাময়ী ভাষাকে কবি নিজের সঙ্গে জড়িয়ে রাখেন, আর তা তাঁকে ছায়াশীতল করে রাখে বৃক্ষরাজির মতো। কবি এই মমতাময়ী ভাষাকে শ্যামলশ্রী দান করে নানা প্রকার দুর্যোগের হাত থেকে তাকে রক্ষা করে চলেন। এ প্রসঙ্গে কবির মনে পড়েছে শৈশবের সাথী 'শিশুশিক্ষা'-র বইটির কথা। শৈশবে বাংলাদেশের শিউলি ফোটা সকালের কথা মনে পড়েছে। মনে পড়েছে মদনমোহন তর্কালঙ্কার(১৮১৭-১৮৫৮) এর 'প্রভাত বর্ণন' কবিতার কথা –

"পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।।"[৫]

এই কবিতার লাইনগুলি শৈশবে কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'তুমি আর আমি, অবিচ্ছিন্ন পরস্পর মমতায় লীন'- এখানে 'তুমি' বলতে কবি মাতৃভাষাকে আর 'আমি' বলতে কবি নিজেকে বুঝিয়েছেন। বাংলা ভাষা, বাংলা বর্ণমালা, কবির অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

ভাষা কবির আজন্ম সঙ্গী, সুখে-দুঃখে ভাষাই তাঁর প্রধান আশ্রয়। আজন্মের সাথী মাতৃভাষার দৌলতেই কবি দেখেন বাস্তব জগৎ ও জীবনকে। এই মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেই কল্পনার সাগরে অবগাহন করেন। স্বপ্নের জাল বোনেন কবি; কেনোনা বিদেশি ভাষায় তো আর স্বপ্ন দেখা যায় না। মাতৃভাষা বাংলা ও তার বর্ণমালা কবির কাছে প্রিয়। তাই এই ভাষা কবিকে স্বপ্নের সেতু গড়তে সাহায্য করেছে। তাই কবির বন্দরে ত্রিভুবন আনন্দময় নোঙর ফেলে। এখানে ভাষার মাধ্যমে ত্রিলোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয় কবির। গলা কাচের মতো স্বচ্ছ জলে ফাৎনা দেখে দেখে রঙিন মাছের আশায় ছিপ হাতে সময় কাটাতেন। কবির মনে জেগেছে রঙিন স্মৃতি – '...মনে পড়ে, কাঁচি দিয়ে/ নক্সা কাটা কাগজ এবং বোতলের ছিপি ফেলে' এইসব ভাবতে ভাবতে কবির ফেলে আসা ছেলেবেলার কথা স্মরণ করেছেন। তাঁর বাল্যকালের পড়া গ্রন্থ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা 'হাসিখুশি' তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের শিশুপাঠ্য গ্রন্থের মধ্য দিয়েই কবি পৌঁছে গেছেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমা ঝুলি'তে বর্ণিত 'রত্নদ্বীপ'এ।

কবির ঘুমের দেশেও ভাষা সঞ্চারিত হয়। গাছের কোটর থেকে কাঠবিড়ালি যেমন নেমে আসে তেমনি ভাষাও কবির ঘুমের দেশে নেমে আসে। কাঠবিড়ালির চঞ্চলতা ও পেলবতা যেমন শৈশব দৃষ্টিকে আকর্ষিত ও রোমাঞ্চিত করে; শৈশবের ভাষা শিক্ষাও তেমনি কবির চেতনাকে রোমাঞ্চিত করেছিল। প্রফুল্ল মেঘপুঞ্জ থেকে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐরাবত – ঠিক তেমনি মাতৃভাষাপ্রীতিও কবির ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে নেমে আসে। পাঠশালা জীবনে শিশুকবির সহপাঠীরা যেমন দুলে দুলে পড়া করত, ঠিক তেমনি মাতৃভাষা দোলা দিত কবিকে। সেই মাতৃভাষার প্রভাব কেবল জীবনে নয়, স্বপ্নেও। কবির নিদ্রায়-জাগরণে ও সুষুপ্তিতে মাতৃভাষার গতিবিধি অনুভব করেন। এখানে কবি মনে করেছেন ভাষা যেন 'লালঠোঁট টিয়াপাখি' –

"বারবার কিম্বা টুকটুকে লঙ্কা-ঠোঁট টিয়ে হ'য়ে
কেমন দুলিয়ে দাও স্বপ্নময়তায় চৈতন্যের দাঁড়।"[৬]

ভাষা টিয়াপাখির মতো দুলিয়ে দেয় স্বপ্নকে। মাতৃভাষার শক্তি ও প্রেরণা এতই গভীর যে চৈতন্যের দাঁড়কে নাড়িয়ে দেয়। মাতৃভাষার শক্তি ও প্রভাব এতটাই যে, স্বপ্নলোকের পথে তাঁর চৈতন্যকে আন্দোলিত করে। কবির নিদ্রার গভীরতম প্রদেশে নিহিত স্বপ্নময় চেতনাকে প্রভাবিত করে।

কবির কাছে চোখের মণির মত প্রিয় এই মাতৃভাষা। মাতৃভাষা কবির আবাল্য সঙ্গী। ভাষা কবির প্রতি মুহূর্তের ভাবকে উন্মীলিত করে বলেই তো সে কবির আঁখিতারা। বাইরের ঘটনাবলি মানুষকে যেভাবে তার বোধকে, চেতনাকে জাগিয়ে তোলে, ভাষা সেই জাগরণকে প্রকাশ করে। এই জন্যই ভাষা কবির কাছে এত প্রিয় চোখের মণি। তাই যুদ্ধে, মহামারিতে, বর্ষায়, অনাবৃষ্টিতে নূপুরের ঝংকারে, বারাঙ্গনার শান্ত ঘৃণায় ধিক্কারে, নৈরাজ্যের এলোমেলো চিৎকারে, সৃষ্টির ফাল্গুনি প্রহরে বাংলা ভাষা কবির চোখের তারায় সর্বক্ষণ জাগ্রত থাকে। শেষ স্তবকে কবি আক্ষেপের সুরে বলেছেন, প্রাণের প্রিয় বাংলা বর্ণমালাকে উপড়ে নিলে; কি তার বাকি থাকে জীবনের। অর্থাৎ কবি বলতে চেয়েছেন, মাতৃভাষাকে উপড়ে ফেলার চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক, ভাষাপ্রেমিক ছাত্ররা উনিশশো বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে রক্ত পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মহীয়সী মাতৃভাষার বেদিপীঠে। তাই কবি আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলেছেন, সেই আত্মত্যাগের মর্যাদা যদি কোনোভাবে ক্ষুন্ন হয় তবে তা হবে বাঙালি জাতিসত্তার ওপর হিংস্র আক্রমণের সমান-

"তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।"[৭]

হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন উচ্চারণের অপমান সইতে হয়েছে বর্ণমালাকে। তাই এ প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থ বলেছেন – "বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশ কবির কাছে যেন পরস্পরের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে – এক উচ্চারিত হলে আর এক এর কথা মনে এসে যায়। এ এক আশ্চর্য সমানুভূতি।"[৮]

।। ৪ ।।

'জন্মভূমিকেই' কবিতায় আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা, নাগরিক জীবনের ক্লান্তিময়তা যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি এসেছে রোমান্টিকতা, অতীতচারিতা, বাংলাদেশের প্রতি কবির নিবিড় ভালোবাসা। জীবনানন্দের মতো শামসুর রাহমানও পল্লি-প্রকৃতির ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তরূপ তার সৌন্দর্য মাধুর্য আস্বাদন করেছেন এবং পাঠককে শুনিয়েছেন সেই অনুভূতির কথা অকৃত্রিম আগ্রহে। শহরের ট্রাফিক গর্জন আর অসংখ্য মানুষের কর্মব্যস্ততা – যাকে কবি 'হুজুগ' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। আসলে শামসুর রাহমান যে অস্থির পটভূমিতে নগর সভ্যতায় বাস করেছেন, তা কেবল কবিকে কর্মব্যস্ত করেনি – দেশভাগের ছিন্নমূল সংস্কৃতির শরিকও তিনি। নগর জীবনে জীবন কাটানোর ফলে কবি যেন সব কিছু হারিয়ে ফেলেছেন। তাই একের পর এক চৈত্র ও শ্রাবণ গতানুগতিকতার পথ ধরে যায়। প্রকৃতির কোনো অমল সুধাময় ছবি কবিকে আলোড়িত করে না। আর আলোড়িত করে না বলেই কবির অন্তর্দৃষ্টি ধরা পড়ে না গ্রাম-বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের জলছবি। যে সৌন্দর্যের সুধারস কবি একদা পান করেছিলেন অতীতে। তাই কবি হয়ত ভেবেছেন বাসি ফুলের মালার মতো শীর্ণ ও মলিন হয়েছে তাঁর জন্মভূমি। কবির এই আর্তি হল – কবি-মনের অন্তঃসার বেদনার হাহাকার। যেহেতু নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক জীবনের অভিঘাত কবির অভিপ্রেত নয়, তাই কবির অন্তর নগর জীবনের যান্ত্রিকতায় পিষ্ট হয়। কবির অন্তরে জন্ম নেয় হতাশায় গভীর বিষাদের ছায়া।

শামসুর রাহমানের কবি-অন্তর নগরকেন্দ্রিক নিষ্ফলা যান্ত্রিকজীবনে পিষ্ট হলেও একদম স্বপ্নহীন হয়ে পড়ে না। হতাশায় ভারাক্রান্ত হলেও বুকের গভীর থেকে তার সব রঙ মুছে যায় না –

"খাটিয়ে রাঙা কল্পনার পাল
তোমার কাছে গিয়েছি সোজাসুজি।"[৯]

মুছে যায় না কল্পনায় সুন্দরের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি, যে ছবিগুলির সঙ্গে তিনি সুপরিচিত। কৈশোরে-বাল্যে যে ছবিগুলি তাঁর হৃদয়ে একটা ঢেউ তুলেছিল; বুকের গভীরে ঢেলে দিয়েছিল অফুরন্ত সৌন্দর্যের অপরূপ রঙ-রস-গন্ধ-বর্ণ। তাই কবি যখন একলা ঘরে কর্মব্যস্ততার পরে বিশ্রাম নেন, তখন চোখ বুজলেই নিমেষের মধ্যে সে কবির অন্তরের সেলুলয়েডে ভেসে ওঠে। রূপসী সেই নারীর সঙ্গে কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ে বেড়ান কবি। স্বদেশপ্রেমের কবি শামসুর রাহমান তখন এক প্রশান্তির জগতে বিচরণ করেন। নগর-জীবনের কর্ম কোলাহল ও গতিচাঞ্চল্য থেকে রেহাই নিয়ে স্মৃতির মধ্যে ডুব দেওয়া, তখন আবার মন দেশ জননীর সান্নিধ্যে যেন ফিরে যেতে পারে; স্মৃতি যেন দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। কবি তার উপরে নৌকা ভাসান বর্ণময়ী কল্পনার পাল তুলে দিয়ে। তখন আর জন্মভূমির নৈকট্য পাওয়ার কোনো বাধা থাকে না। এভাবেই তিনি দূরে থেকেও জন্মভূমির কাছে সোজাসুজি পৌঁছে যান।

কবির এই যাওয়া স্মৃতিরোমন্থনে কল্পনার রঙ মেখে; কল্পনার পাল খাটিয়েই তিনি প্রত্যক্ষ করেন তাঁর মানসীকে কবি-অন্তরের নিমগ্ন কল্পনার রঙে অনুভবে ও ধ্যানে। তিনি ছুটে যান পল্লিপ্রকৃতির বুকে। সেখানে মনের মধুরিমা দিয়ে সাজান তাঁর প্রিয়তমারূপি জন্মভূমিকেই। শহরে নয়, কবির মন ছুটে চলে 'তালদিঘির ঘাটে', 'ফসলছাওয়া মাঠে', 'চিলেকোঠায়' এবং 'দূর চলনবিলে' – সর্বত্র তার উপস্থিতি। কবির ভালোবাসা থেকে জন্ম নেয় স্বদেশপ্রেম। কবি প্রিয়ার উপস্থিতির মধ্যে দেখতে পান জন্মভূমিকে। কবির তাই পূর্ব প্রণয়ের স্মৃতি আকস্মিক অপ্রাপ্তির নৈরাশ্যে খাঁ খাঁ করলে এই মূর্তির অনুভব হৃদয়ে আশাবরী রাগিণীর সঞ্চার ঘটে –

"কে আশাবরী শোনায় বারবার,
হৃদয়ে জলে স্মৃতির মরু ধু-ধু।"[১০]

'আশাবরী' তাঁর হৃদয়ে ঢেউ তোলার সঙ্গে সঙ্গে কবি স্মৃতি কাতরতায় দগ্ধ হতে থাকেন। যে অতীত ছিল তাঁর কাছে সুখকর, আনন্দময়, স্বপ্নজাত – তা আজ তাঁর জীবনে দূর অস্ত। আজকের এই কালবেলায় এই স্মৃতি কবির স্বদেশপ্রেমের একমাত্র অবলম্বন। এই স্মৃতি দেশ জননীকে দেখবার একমাত্র আয়না কবির। কেনোনা সমকালের বিধ্বস্ত বাংলাদেশ বঙ্গজননীর সেই চিরকালীন রূপটি চিরদিনের মতো বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

স্বাধীনতার প্রাক্‌মুহূর্তে খান সেনারা বাংলাদেশের মানুষের বুকে চালিয়েছে পাশবিক অত্যাচার। সেই অত্যাচার কবির হৃদয়টাকে যেন পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। এতো সংগ্রাম, এতো রক্তপাতের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেল। সেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন কবি তরুণ বয়স থেকে দেখে আসছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের তখন নিত্য অভাব। এই অভাবের মাঝেই কবি খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃতির তন্ময়তা, ইতিহাসের কীর্তি, রাজ-ঐশ্বর্য – সবকিছুকে তুচ্ছ করে দিয়ে পাপীরা অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রূঢ় এই বাস্তবের জগতে কবি বেঁচে থাকার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই যে নারীকে তিনি ভালোবাসেন তাঁর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেতে চান দেশ-জননীকে। ভালোবাসার মধুর রসে বাৎসল্য রসের অনাবিল ধারা এসে মেশে। তাই তার প্রেমিকার শরীরী বিন্যাসে, চোখের চাহনি আর লুটিয়ে পড়া কালো চুলে খুঁজে পান কবি বাংলাদেশকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন – "প্রেমিকার গলায় আশাবরী রাগে কবি যেন শুনতে পান জননীর মমতা মেদুর কণ্ঠস্বর। আর তখনই জেগে উঠেন বঙ্গজননী প্রেমিকার রূপে নগরে ও গ্রামে গঞ্জে। আধুনিক বাংলা কবিতায় দেশ ভাবনার নতুন ভূখণ্ড জেগে ওঠে।"[১১] শামসুর রাহমানের আগে দেশকে এইভাবে কেউ দেখেছেন বলে মনে হয় না। তিনি যথার্থ অর্থেই তাঁর দুই কবিতার মধ্যে ভাষাপ্রেম থেকে

স্বদেশপ্রেমের দিকে যাত্রা করেছেন। 'জন্মভূমিকেই' কবিতাটি শেষ পর্যন্ত প্রেমের আগুনে বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমের কবিতা হয়ে উঠেছে।

সূত্র নির্দেশ:

১। অশ্রুকুমার সিকদার, হাজার বছরের বাংলা কবিতা, কবি প্রকাশনী, কাঁটাবন, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ: অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬, পৃ. ২৯৮।

২। অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদিত), আধুনিক কবিতা সঞ্চয়ন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পৃ. ১৮৫।

৩। আবুল হাসনাত(সম্পাদনা), একুশে ফেব্রুয়ারি, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১১, পৃ. ১৬৫।

৪। শামসুর রাহমানের 'কবিতা সংগ্রহ', পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১২১।

৫। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শিশুশিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৫৯।

৬। অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদিত), আধুনিক কবিতা সঞ্চয়ন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পৃ. ১৮৭।

৭। ওই, পৃ. ১৮৮।

৮। অশোককুমার মিশ্র, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা [১৯০১-২০০৮], দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৪৩৯।

৯। অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদিত), আধুনিক কবিতা সঞ্চয়ন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পৃ. ১৮৫।

১০। ওই, পৃ. ১৮৫।

১১। তপন গোস্বামী (সম্পাদনা), এ সময়ের কবিতা, শৈলী গোস্বামী- 'জন্মভূমিকেই: একটি ব্যতিক্রমী স্বদেশপ্রেমের কবিতা', আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ২৮৯-২৯০।